ঈশ্বরের হাত

আহমেদ সাকির

পুজো সংখ্যার জন্য লিখতে বসে এবারই প্রথম কিছুটা হোঁচট খেল প্রত্যুষ।

গত কয়েক বছর ধরেই গল্পলেখার প্রতি প্রত্যুষের এক অদ্ভুত আগ্রহ জন্মেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পত্রিকায় তার কয়েকটি লেখাও বেরিয়েছে।

প্রত্যুষ একটা বেসরকারি ব্যাংকে কাজ করে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু সময় পেলেই সে খাতাকলম নিয়ে বসে পড়ে। ওর মাথার ভেতর কেবলই চক্কর দেয়—আর-পাঁচজন মানুষের মতন খেয়ে-পরে টুপ করে মরব কেন? মরার আগে একবার প্রজাপতি হয়ে উঠতে হবে। শুঁয়োপোকা থেকে বেরিয়ে এসে রঙিন ডানায় ঝলমল করবে সে। আকাশে ছড়িয়ে দেবে স্বপ্নময় আলো।

প্রত্যুষ বিশ্বাস করে নদী আর জীবন দুটোই এক। নদীর জোয়ার ভাটার মতো জীবনেও জোয়ার ভাটা আসে। যে নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে না, সে আবার নদী নাকি ? সে তো মরা খাত!

ওর জীবনে বোধ হয় ভাটা চলছে এখন। পুজো সংখ্যার জন্য কয়েকটা লেখা পাঠাতে হবে। কাগজ কলম নিয়ে বসেওছে বেশ কয়েকবার। এবার একটা লেখা নিশ্চয়ই বার হবে। কিন্তু নাঃ! একটা লেখাও দাঁড় করানো যাচ্ছে না। কলমের আগা থেকে নতুন কোনো বিষয় যেন নামতেই চাইছে না।

এমন সময় এলেন দীপক ঘোষ। প্রত্যুষের মনে হল গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এক টুকরো মিঠে বাতাস। গঙ্গার ঘাটে ঢেউ খেলে-যাওয়া জলের অপার স্নেহ। অদ্ভুত মায়া জড়ানো।

দীপক ঘোষ বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। অনেক বই বেরিয়েছে তাঁর। ছোটোদের লেখার অনেক বড়ো মাপের লেখক তিনি। একদিন হুগলির উত্তরপাড়ার বইমেলায় তাঁর সাথে প্রত্যুষের আলাপ হয়। এক আলাপেই বুঝেছিল চমৎকার মানুষ। একেবারে মাটির মতোই খাঁটি। সারা দেহে মাটির সোঁদা গন্ধ।

—একদিন আসুন না স্যার আমাদের বাড়ি। টাকি ঘুরিয়ে দেখাব। মিনি সুন্দরবন, বাংলাদেশ বর্ডার, কেয়া গাছ—খুব সুন্দর লাগবে আপনার।

—তাই নাকি ?

—হুম। লঞ্চে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখবেন।

—তাহলে তো একদিন যেতেই হয়।

তো, সেই দীপক ঘোষ এবার এসেই বলে দিলেন, বাবা, আমি কিন্তু তোমার বাড়িতে তিনদিন থাকব।

প্রত্যুষ বলল, তিনদিন কেন? যতদিন ইচ্ছে থাকুন না, স্যার।

তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, আবার সেই স্যার ? দাদা বলবি, দাদা। স্যারটা এখন মাথা থেকে সরা না!

তাই কি বলা যায় ? অত বড়ো মাপের লেখক তিনি। ছোটোদের লেখার রাজা। শুধু টিচার হলেই স্যার বলতে হয় নাকি ? এঁদের কাছ থেকেও তো আমরা প্রতিমুহূর্তে কত কী শিখছি, কতকিছু জানছি! কত রকম পাঠ নিচ্ছি!

প্রত্যুষ প্রকাশ্যে এসব কিছু বলল না। মুচকি হেসে বললে, আমি যদি আপনার ওই 'আগুনের মেয়ে'র ছোট্ট ফুলু, যে আগুনের ডানা পরে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে হাজার বছরের লোহার শিকলকে কেটে দিয়েছিল, তার মতো একদিন আমার স্বপ্নটাও সত্যি করে দেখাতে পারি, সেদিনই আপনাকে দাদা বলব।

দীপকবাবুর ঠোঁটের কোণে সবসময় একটা হাসির রেণু লেগেই থাকে। একগাল হেসে বললেন, দূর বেটা, কী যে বলিস! ঠিক আছে, নে, তাই-ই হোক।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সেরেছেন দীপকবাবু। বয়েস হয়েছে তো, খুব বেশি খেতে পারলেন না। বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছেন দুজনে। পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। তিনি পরে আছেন ছাইরঙা হাফ হাতা ফতুয়া আর সাদা পাজামা। চোখে পুরোনো আমলের চশমা। পায়ে চামড়ার জুতো। আর প্রত্যুষ পরেছে পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে কিটো। চোখে নীল ফ্রেমের চশমা।

প্রায় বিরাশি বছর বয়সি মানুষটার সঙ্গে কথা বললে নিজের বয়স নাকি অনেকটাই কমে যায়! মনে সবুজের ঘ্রাণ উড়ে বেড়ায়। প্রত্যুষের তো ওরকমই ধারণা।

প্রত্যুষদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা পেরোলেই মাঠ। সবুজ শাকসবজি, গাছপালা আর ছড়ানো-ছিটানো কিছু বাড়ি সামনে পড়ে। আগে ঘরগুলো ছিল খড়ের আর টালির। এখন সরকারি টাকায় পাকা বাড়ি। ওঁরা খেজুরপুকুরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পুকুরটা এখনও আছে, তাকে ঘিরে রেখেছে আম জাম কাঁঠাল আর বাঁশ ঝাড়। একটা গাছের ডাল পুকুরের উপরে বেশ কিছুটা নুয়ে পড়েছে। ওখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফিঙেরা এসে উঁকিঝুঁকি মারে। ওরা জলে মুখ দেখে নেয়। ওটাই যে ওদের আয়না।

অবশ্য খেজুর গাছ এখন অনেকটাই কমে এসেছে, আর নেই বললেই চলে। তখন ছোটোবেলায় কত খেজুর পেড়ে খেত, নীচেও পড়ে থাকত অনেক। নিজে তো খেতই, মায়ের জন্যেও আনত।

মা যেন অবাক হয়ে যেত, হ্যাঁ রে, এত খেজুর তুই কোথায় পেলি ?

—খেজুরপুকুরে।

—ফের গাছ থেকে পেড়েছিস বুঝি ?

মায়ের যত না গাছমালিকদের ভয়, তার চেয়ে বেশি ভয় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে কিনা।

—না না, নীচে পড়ে ছিল। তাই কুড়িয়ে আনলুম তোমার জন্যে। খাবে, মা ?

গাছ থেকে পেড়ে আনার নাম করলে আর রক্ষে আছে! ওপথে সে আর পা মাড়ায়! বাব্বা! সেবার সত্যিটা বলে কী মারটাই না খেয়েছিল!

তখন প্রত্যুষের কাজ ছিল সারা রাজ্যের পাখি ধরে বেড়ানো। শালিক, চড়ুই আর ঘুঘুই ধরত বেশি। দু-একবার টিয়াও ধরেছে। কত পাখি যে মেরেছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। একদিন বিকেলে প্রত্যুষ তার বন্ধু টুকাইদের বাড়ির পাশে বাঁশ গাছে টুনটুনির একটা বাসা দেখতে পেয়েছিল। বাসার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দ্যাখে—ওমা! দুটো বাচ্চা! একেবারে ছোটো, গায়ে এখনও পালকই গজায়নি।

প্রত্যুষ ভাবল বাচ্চা নিয়ে সে কী করবে। এত ছোটো ছোটো বাচ্চাকে সে তো খাওয়াতেও পারবে না। দু-দিনেই হয়তো মরে যাবে। সন্ধেবেলা ধাড়িরা বাসায় ফেরে। ও সন্ধেবেলায় বাচ্চার মা সমেত বাসাটাকে ছিঁড়ে বাড়ি নিয়ে আসল।

মা তাই দেখে খুব রেগে গেল। পড়াশোনার নামগন্ধ নেই, সারাদিন শুধু টো টো করে আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়ানো!

আর রাগবে না-ই বা কেন, সে তো বাসা ভেঙে আনলই, আবার ধাড়ির পায়ে দড়ি বেঁধে খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখল।

ওর মা জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে পাখি ধরে এনেছিস?

মায়ের গলার স্বর শুনে প্রত্যুষ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুঝল তার কপালে আজ অশেষ দুর্গতি। ভয়ে ভয়ে বলল, পন্টুদের বাঁশ ঝাড় থেকে।

—ওই কবরখোলার পাশে ? সাপে খায়নি তোকে?

—কই সাপ ছিল না তো!

আর যাবে কোথায়! উঠোন থেকে একটা চপ্পল তুলে নিয়ে চপাট চপাট করে কষিয়ে দিল কয়েক ঘা। তারপর চটার দরজা টেনে বাইরে থেকে দিল তালা ঝুলিয়ে।

বেচারা প্রত্যুষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেঁদেই চলেছে। কিন্তু কতক্ষণ আর কাঁদা যায়? কান্না থামিয়ে একটা সময় 'বেদের মেয়ে জোছনা'র 'মা, আমি বন্দি কারাগারে' গানটা দরাজ গলায় গাইতে শুরু করল। আশেপাশে কচিকাঁচা, বড়োরাও জড়ো হল। আর কী আশ্চর্য! পাখিটাও লেজ নেড়ে নেড়ে ওর গানে তাল দিতে লাগল। প্রত্যুষের মায়ের দয়া হল কিনা জানি না, তবে পাগলের মা যখন বলল, আহা রে, এটটুকুন ছেলের কেউ অমন করে মারে? এই শিখা, দে, ছেড়ে দে, তখন ওর মা ছেড়ে না দিয়ে পারেনি।

দীপক ঘোষকে গল্পটা বলতেই তিনি তো খুব বড়ো বড়ো চোখে প্রত্যুষের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হেসে বললেন, বাব্বাঃ! কী ডানপিটে ছেলে রে তুই!

স্যার, এটা তো কিছুই না। ভগ্নাংশ মাত্র।

বলিস কী ?

হ্যাঁ! এটা তো জাস্ট ট্রেলার। হাঁসের ঘটনাটা শুনলে তবেই বুঝবেন ডানপিটে কাকে বলে!

তাই নাকি? তা বল তাহলে শুনি।

তখন আমাদের মাটির বাড়ি। রান্না ঘরের পেছনে ছিল ছাইগাদা। সেখানে হাঁস মুরগি চরে বেড়াত। গরিব হলে কী হবে, ছোটো থেকেই আমি একটু গাট্টাগোট্টা ছিলাম। সাহসও ছিল তুলনায় বেশি।

একদিন ভরদুপুরে একটা হাঁস ধরে পাশে ময়নাদের বাড়ি নিয়ে গেলাম। সেখানে খেলা করছিল ময়না আর ওর কাকার মেয়ে লক্ষ্মী। ঠিক করলাম হাঁসটাকে কেটে ওর মাংস দিয়ে চড়ুইভাতি করব।

এই পর্যন্ত শুনেই দীপকবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। ওর মুখের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, তখন তোর বয়স কত ছিল?

কত আর! আমার আট-নয় হবে। আর ওদের আরো কম।

তারপর? চড়ুইভাতি হল শেষপর্যন্ত?

প্রত্যুষ তো হো হো করে হেসে উঠল। অনেকদিনের আগের ঘটনা হলে কী হবে, মনে পড়লেই ওর খুব হাসি পায়।

সঙ্গে ছুরি ছিল না তো। তাহলে কী দিয়ে কাটব? দেখি, ময়না চালের বাতা থেকে একটা নিড়ানি জোগাড় করে আনল। তারপর লক্ষ্মী হাঁসটার ডানা ও পাগুলোকে ভালো করে ধরল। আর মাথাটা ধরল ময়না। আমি নিড়ানি দিয়ে গলাটা পোঁচাচ্ছি।

বাব্বা! এ তো দেখছি হিন্দি থ্রিলার! ওই একরত্তি বয়েসেই পাক্কা খুনি!

খুনি ঠিক নয়, হাফ খুনি।

দীপকবাবু হঠাৎই থেমে গেলেন। শব্দটা শুনে একটু চমকে উঠলেন, হাফ খুনি! সেটা আবার কেমন?

হুম। পুরোটা শুনুন, বুঝতে পারবেন। ওই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সমস্যাটা শুরু হল এরপর। হাঁসটা হঠাৎই খুব জোরে ডানা ঝাঁপটা দিয়ে উঠল। পায়ের খিঁচুনি শুরু করল। বাচ্চা মানুষ তো, ওরা দুজন হাঁসের শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। হাঁসটা ঝটকা মেরে ওদের

হাত থেকে বেরিয়ে গেল। তখন সবে অর্ধেক গলা কাটা হয়েছে। ওই অবস্থায় হাঁসটা প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে সারা বারান্দায় ছোটাছুটি করতে লাগল। সাদা মাটির ওপর তখন রক্তের ফুল ফুটছে। আমরা তো নেহাত শিশু, অত জ্ঞান হয়নি, হাঁসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তার ওই ছোটাছুটি দেখছি।

হাঁসের শব্দ শুনে ছুটে আসে পাশের বাড়ির টুলু মাসি। ততক্ষণে আরও কয়েকজন এসে গেছে। খুনি আর তার সাগরেদদের হাতেনাতে ধরে ফেলল।

কী সব্বনাশ! তারপর কী হল ?

কী আর হবে। আমিই যেহেতু নাটের গুরু, মানে মূল আসামি, তাই আমাকে হাঁসের দামের অর্ধেক দিতে হল। তখনকার দিনে একটা হাঁসের দাম ছিল চল্লিশ টাকা। আমাকে দিতে হয়েছিল কুড়ি টাকা। আর ওরা দুজন দিয়েছিল দশ টাকা করে।

বাঃ! খুব ইন্টারেস্টিং তো! তারপর ? সেই হাঁসটার কী হল ?

হাঁস তো তখনও জ্যান্ত। ওই অবস্থাতেই হাঁসটাকে ধরে ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছিল। মাংসের অর্ধেক নিয়েছিলাম আমরা, আর বাকি অর্ধেক ওরা ভাগ করে নিয়েছিল।

এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! একেবারে গল্পের মতো।

তবে ব্যাপারটা এত সহজে হয়নি। গরিব ছিলাম তো, খাওয়া তাই জুটত না। অত টাকা কোথায় পাব? মা বারান্দায় বসে লোকেদের কাঁথা সেলাই করত। দুপুরে ফালতু না ঘুমিয়ে মা সারা রাজ্যের কাঁথা সেলাই করে দিত। বিনিময়ে যা সামান্য কিছু পেত, সেটাই অনেক। কখনও কখনও মা ঘুমে ঢলে পড়ত। হাতে তখনও সুঁচ-সুতো আর কাঁথা ধরাই আছে।

আমি হয়তো মায়ের গায়ে একটু ঠ্যালা দিতুম। অমনি মা ধড়ফড় করে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাত। আমি বলতুম, তুমি তো পড়ে যাবে মা। তারচেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও না!

মা কিন্তু হার মানত না। উলটে আমাকেই যেন বকে দিত। বলত, যা! ঘুমুচ্ছি কোথায় ? একটা কথা ভাবছিলুম তো, তাই ওরকম মাথাটা একটু নীচু হয়ে গেছিল।

আমি ফের বলতুম, না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। কতবার আস্তে আস্তে ডাকলুম, কই তুমি সাড়া দিলে না তো!

মা তখন বলত, গরিব মানুষের কি দুপুরে ঘুমুতে আছে? আর ঘুমিয়ে ফালতু ফালতু চর্বি বাড়িয়ে কী লাভ?

সেই মা তখন এত রেগে গেল, হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই দমাদম পেটাতে লাগল। আর দাদা তো আমাকে তুলে প্রায় আছাড় মারতে গেছিল। কোনোরকমে সে-যাত্রা রক্ষে পেয়েছিলুম। তারপর আমরা অনেক কষ্টে লোকের কাছ থেকে ধার করে টাকাটা দিয়েছিলুম।

যাক, তবু শেষপর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হল, এটাই অনেক।